পর্যটক-২

মোস্তফা তানিম

একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে সে বলল, না।
তার মানে কি? ভ্যালেন্টাইন নেই? নাকি আছে কিন্তু আরও কোনো ভাল জায়গায় যায় তারা? ওদিকে লিওর মুখেও হাসি। ভাবখানা এই তো আমি এখানে। আমার সঙ্গে নেক্সট ভ্যালেন্টাইনস ডে তে আসতে পারো। গাড়ি ভাড়া করে এ কাকে নিয়ে এলো নোমান?

সমুদ্রের কোনো বালুকা বেলা নেই, সামান্য একটু কাদামাটির মতো জায়গা। সেখানেও কিছু উৎসাহী মানুষ নেমে পড়েছে। পানির উপরে হালকা বাস্পের মতো কুয়াশা। হার্নান্দেজ জানালো, লিমা শহর আসলে একটা মরুভূমির মধ্যে। মরুভূমি বলতে বোঝায় আরব দেশ। পেরুর রাজধানী যে মরুভূমির উপরে অবস্থিত তা সে জানতো না। লিওর কিছু শেখার ইচ্ছা আছে বলে মনে হলো না। তার মনোযোগ এমিলির দিকে। এই ছেলেটি কি জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট? আচ্ছা সে কি আমেরিকা যেতে চায়? বা জাপানে? জিজ্ঞেস করতেই হাসলো সে। বললো কোথাও যেতে চায় না। পেরুতেই নিজের ব্যবসা গড়ে তুলবে। সে সন্তুষ্ট কি না পরিষ্কার হলো না। তবে তার একটা স্বপ্ন আছে। সে আশায় বুক বেঁধেছে। এমিলি কি আমেরিকা চলে যেতে চায়? সেও চায় না। তারা এই দেশে অনেক আনন্দে আছে। ঘুরতে তো যেতেই পারে যে কোথাও, তবে থাকতে নয়। একদিন বাংলাদেশও এমন হবে। সব তরুণ তরুণীরা বাইরে ঘুরতে যাবে, থাকতে নয়।
মিঃ জাহির, আপনি আসলে কোন দেশের?
এটা ’ভাই আপনার বাড়ি কোন ডিস্ট্রিক্ট’ জাতীয় সস্তা একটা প্রশ্ন। তবে হার্নান্দেজ ভদ্রতা জানে, পরিচয়ের প্রথমেই সে একথা জিজ্ঞেস করে নি। বাকী দু‘জনের চোখেও কৌতূহল। লিও বলে ফেললো ইন্ডিয়া। তাকে খুশী করার জন্যে আরো বললো, ওই যে ওখানে তোমাদের ইন্ডিয়ান কার কোম্পানী খুলেছে, মাহিন্দ্র কার।
মাহিন্দ্র কারের খবর নোমান জানে না। সে বললো বাংলাদেশ।
- ও হ্যা, সেভেন্টি ওয়ানে স্বাধীন হয়েছে।
লিও এবং এমিলি তাদের ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যেন প্রকাশ না পায় সেই দিকে নজর রেখে ’তাই নাকি’ গোছের কিছু একটা বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

এমিলিকে প্লেনে খাটো লাগছিল। এখন হাই হিল পরেছে, লম্বা দেখাচ্ছে। তার মুখে একটা স্নিগ্ধতা আছে। সমুদ্রের বাতাসে চুল এলোমেলো করে দিলে তাকে আরো সুন্দর লাগছে। এমিলি নিজ থেকেই বললো, ওদিকটায় চলো, লারকোমার শপিং সেন্টার দেখা যাবে। চলো ঘুরে আসি। কিন্তু ওদিকে যেতে গিয়ে এক বিপত্তি ঘটে গেল। হার্নান্দেজ হন্ত দন্ত হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো মিঃ জাহির, আপনার সাথে পাসপোর্ট আছে?

পাসপোর্ট নোমান আনে নাই। কোনো বর্ডার ক্রস করছে না সে, তাহলে পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরবে কেন? হার্নান্দেজের গলার স্বর একটু ঘাবড়ে যাওয়ার মতো।
এখানে পুলিশ খুব তৎপর, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশের লোক দেখলে তারা থামিয়ে পাসপোর্ট চেক করে। অনেকে অবৈধভাবে আসে তাই। ওই যে পুলিশের গাড়ি। রাস্তার ওপাশে পুলিশের একটা গাড়ী, সেখানে দু'জন পুলিশ লেকচারারের সাথে কথা বলছে। এদিকে বার বার তাকাচ্ছে।
আমি তো ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ থেকে আসি নাই।
- মিঃ জাহির, ওদের সাথে সাবধানে কথা বলবেন। আপনাকে দূর থেকে দেখেই চেনা যায় আপনি ইন্ডিয়ান। সঙ্গে পাসপোর্ট না থাকলে ধরে নিয়ে যেতে পারে। একবার ধরলে অনেক ঝামেলা হবে। এখানে আপনার চেহারার অনেকে এসে পেরুবিয়ান সেজে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে পেরুর বদনাম হচ্ছে।
পুলিশ দু'টো এগিয়ে আসছে, সাথে লেকচারার। পেরুবিয়ান সুন্দরীর সামনে আবার হাতকড়া পরাবে না তো?
কিডন্যাপারের কবল থেকে বাঁচার জন্যে এতো আয়োজন করলো সে, পড়লো গিয়ে শেষে পুলিশের কবলে। আচ্ছা এটা একটা যোগসাজশ নয়তো? হয়তো হার্নান্দেজও যুক্ত আছে। খবর দিয়ে ভুয়া পুলিশ নিয়ে এসেছে। পাসপোর্ট সাথে নেই দেখে ধরে নিয়ে যাবে গোপন কোনো জায়গায়। তারপর মুক্তিপণ চাইবে। এমিলিকে খানিক উদ্বিগ্ন মনে হলো। একটা সদ্য পরিচিত মেয়ের সামনে হেনস্থা হওয়ার মতো লজ্জার বিষয় আর হয় না। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। লেকচারারের মুখে শুধু ডেলফিনেস শব্দটা ধরতে পারলো সে। তারমানে ডেলফিনেসে থাকা লোককে কেউ ঘাটাতে পারবে না। বয়স্ক পুলিশটা মনে হয় অফিসার। অন্যজন তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। আশে পাশে অনেক ট্যুরিস্ট তাদের কিছু বলছে না, ধরতে আসলো নোমানকে।

পুলিশ অফিসার নোমানকে এক নজর দেখলো। মানুষের দৃষ্টিতে কিছু একটা থাকে যা দেখে ভেজাল এবং খাঁটি, নরম এবং কঠিন আলাদা করা যায়। সে যা বোঝার বুঝে নিল। পুরো ভোল পালটে হাসি মুখ করে বললো বুয়েনেস দিয়েস, যেন এটা বলার জন্যেই সে এখানে এসেছে। হার্নান্দেজ রসিকতাপূর্ণ কিছু বললো। পুলিশ ওর দিকে আরেকবার তাকাল, বন্ধু সুলভ তাকানো। তারপর চলে গেলো।

নোমান ভেবেছিল পাসপোর্ট সাথে না রাখায় হার্নান্দেজ তাকে বড়সড় একটা লেকচার দেবে। কিন্তু তা সে করলো না। উলটো এমন ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো। সমুদ্রের ধারে খোলা একটা রেঁস্তোরায় বসলো তারা। এমিলি তাকে এদেশের নাম করা খাবার সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে।
সেবিচে খেয়েছো?
সেবিচে কি তা নোমান জানে না। অনেকটা নাকি জাপানীজ শুশির মতো। মানে কাঁচা মাছ? শুশির মুখে দিলেই নোমানের বমি আসার অবস্থা হয়। নোমান বললো মাছ পছন্দ নয় তার।
পোয়ো ল্যব্রাসা?
কালই খেলাম। খুব মজা। এখন স্যান্ডুইচ হলেই চলে।
কম খাওয়াই ভাল, তিন জনের বিল তাকেই দিতে হবে। হার্নান্দেজ নিয়েছে একটা বিশাল বার্গার। এক কামড় দিয়ে নোমানকে জিজ্ঞেস

করলো, আমেরিকায় কতদিন? নোমান আট বছরকে বাড়িয়ে বললো এইতো দশ বছর হয়ে গেল। হার্নান্দেজের মুখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। একেবারে নতুন বামুন সে নয়। আবার কথার তুবড়ি, তোমাদের মতো অনেক বিজনেসম্যান, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডিয়া থেকে আসে ঘুরতে, বড় হোটেলে উঠে। তোমাদের কথা আলাদা। পুলিশ খুঁজছে যারা জাল ভিসা নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার ধান্ধায় আসে তাদের।
সাত খন্ড রামায়ন পড়ে সীতা কার মাসী। নোমান কিছু বলার আগেই এমিলি বললো, ও ইন্ডিয়া থেকে আসে নি, এসেছে আমেরিকা থেকে। ঠিক কথা, এমিলি নিজেই তার প্রমাণ, ওয়াশিংটনে একই প্লেনে উঠেছে তারা।
আর আমি বাংলাদেশের লোক, ইন্ডিয়ান নই।
হার্নান্দেজ খুব লজ্জিত হয়ে হাত কচলালো, সে ইন্ডিয়া উপমহাদেশ বোঝাতে চেয়েছে। বাংলাদেশী মানুষকে ইন্ডিয়ান মনে করলে যে সে ক্ষুব্ধ হয় সেটা তার জানার কথা নয়। তবে তারচেয়েও বড় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইন্ডিয়া-পাকিস্তান গুলিয়ে ফেললে। এটা অক্ষমনীয় অপরাধ। বব এই ভুল করতো। আনিলকে ভাবতো পাকিস্তানী আর ফায়াসালকে ইন্ডিয়ান। আনিলকে হয়তো বললো তোমাদের পাকিস্তানের একটা নিউজ- সে মাঝ পথে থামিয়ে উত্তর দিত আমি ইন্ডিয়ান। আর ফায়সালকে হয়তো বললো, কাল একটা সার্ট কিনলাম তাতে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা, ফায়সাল অনেক কষ্টে রাগ দমন করে বলতো আমি ইন্ডিয়ান না। বব বুঝেছে ব্যাপারটা নিছক পাশের একটা দেশের লোক ভেবে ভুল করার চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ। এই ভূলের জন্যে এরা জেল জরিমানা দাবী করে বসতে পারে। হার্নান্দেজ কিছুক্ষণ আর কথাই বললো না। বার্গার শেষ করে সে বললো তোমাদের দু'জনের একটা ছবি তুলে দেই। খুবই ভাল প্রস্তাব। দু'জনে দাঁত বের করা উদার হাসি দিয়ে পোজ দিল। এ ছবি পিন্টুকে দেখাতে পারলে একটা মজাই হবে। আর তখন বেঁটে মতো মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক এমিলির দিকে এগিয়ে আসতেই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে একটা মিথ্যা উচ্ছাস দেখিয়ে বললো পাপা। তারপর স্প্যানিশে আল্লাদী স্বরে কথা শুরু করলো। এমিলির বাবা নয় তো! লোকটা একবার নোমানের দিকে তাকালো তারপর হার্নান্দেজকে দেখে নিল। নোমান তড়িঘড়ি হত বাড়িয়ে দিয়ে বললো হাই। এমিলির সম্ভাব্য বাবা গম্ভীর গলায় স্প্যানিশে কোনো সম্ভাষণ জানালো। এমিলি দুই হাত নাড়িয়ে আবদারের গলায় তাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। একটা ছেলের সাথে ঘুরাঘুরি করা এদেশে তেমন বড় কোনো ব্যাপার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এমিলি ঘাবড়ে গেছে বলেই মনে হলো। লোকটা অল্প দু'য়েকটা কথা বলে চলে গেল। এমিলি একটা হাঁফ ছাড়লো। এর মধ্যে সে এক গন্ডা মিথ্যা বলেছে। তার ক্লাস আজকে ক্যান্সেল, টিচার অসুস্থ। নোমানের সাথে তার ক্যালিফোর্নিয়ায় পরিচয়। তার চাচাতো ভাই হোজের বন্ধু নোমান। মানুষ এতো অল্প সময়ে এতো কথাও বানিয়ে বলতে পারে?
আমি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার বাবা কড়া মানুষ।
কড়া বাবা এখানে কি ধরণের শাসন করে নোমানের জানা নেই। তার কড়া বাবার অফিসে প্যারিস থেকে একটা গ্রুপ এসেছে, সেই ফরাসী গ্রুপকে শহর দেখাতে নিয়ে এসেছেন তিনি। কপাল কাকে বলে।
-তোমার বাবাকে খুব ভদ্র লোক বলে মনে হলো।
একথা শুনে এমিলি খুশী। তবে সে এখনও অন্যমনস্ক।

– পাপা তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বললো।
– আরেকটু ঘুরবে না? প্রেসিডেন্টের ভবন?
– না যাওয়াই ভাল হবে। আমি বরং বাসায় যাই, হোজেকে আবার ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখতে হবে।
একটা মিথ্যা ঢাকতে দশটা মিথ্যা বলতে হয়। আর যে একটা মিথ্যা তাৎক্ষণিক বানিয়ে বলতে পারে সে দশটাও পারে। ভালই যাচ্ছিল, ওর বাবা কোত্থেকে এসে ভেস্তে দিল।

যদি উত্তরা থেকে ফার্মগেইট, বাংলা মোটর, গুলিস্তান পেরিয়ে কেউ সদরঘাটে যায়, ঢাকা শহরের অনেকটাই তার দেখা হয়ে যাবে। লারকোমার থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনের রাস্তাটা অমন শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে। যতই যাওয়া যায় কাঁচে মোড়ানো সুদৃশ্য বিলডিং এর বদলে পুরানো বিলডিং তত বেশী চোখ পড়ে।

‘A journey is best measured in friends, rather than miles'.

ফ্রেইন্ড চলে যাওয়ায় আনন্দের ভ্রমনে একটু ছেদ পড়েছে। এখন মাইলের ভ্রমন হচ্ছে শুধু। লিও স্প্যনিশে রিকোয়েস্ট করেও কায়দা করতে পারলো না। এমিলি বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় নেমে গেল। নামার সময় একটা ট্যাবলেট দিল তাকে, এটা খেলে নাকি উচ্চতা জনিত কারণে শ্বাস কষ্ট হবে না। প্লেনে ওঠার ঠিক আগে খেতে হবে। সাথে মার্কোসের ফোন নাম্বার। ভুলে নি তাহলে। বেশ গোছানো স্বভাবের মেয়ে। জীবনে উন্নতি করবে।

প্রেসিডন্টের ভবন লিমার ঐতিহাসিক জায়গা। কয়েক শ’ বছরের পুরানো। পিজারো বানিয়েছে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে বিরাট সান বাঁধানো চত্বর।

মানুষ এখানে এসে

হাটা হাটি করে, বেঞ্চে বসে থাকে। এক দিকে প্রাচীন কালের প্রকান্ড গির্জা। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের চুড়া। অন্যদিকের পুরোনো বিলডিংটা একটা মার্কেট। সেখানে অনেক ভিড়। হার্নান্দেজ ওদিকে হাত নির্দেশ করে বললো, জায়গাটা ভাল না। দিনে দুপুরে ছিনতাই হয়। মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প। নোমান ভাবলো, দিনে দুপুরে ছিনতাইয়ের দেখছো কি? বাংলাদেশে যাও একবার।

বেলা বাড়ার কারণে হার্নান্দেজ একটু ঝিমিয়ে পরেছে, ধারা বিবরণীতে ধার নাই। – ফ্রান্সিসকো পিজারো স্পেইন থেকে এসে পেরুতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। লিমা শহর ফ্রান্সিস্কো পিজারোর তৈরী। ওই যে দেখ তার মূর্তি। মূর্তি পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তুলে নিল নোমান।

তুমি আরো ঘুরতে চাও, না হোটেলে ফিরে যেতে চাও?
ভদ্রতা করে বলা আর কি। আসলে বরাদ্দ সময় শেষ, এখন চলে যেতে হবে। একদিনের জন্যে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। কান্ড তো আর কম ঘটলো না। আজ সারাদিন কারো ফোন আসে নি। পিন্টু অবশ্যই ফোন করবে, তবে রাতে। এমিলির সাথে বেশী কিছু হয়ে যাচ্ছে কিনা এটা উদঘাটন না করা পর্যন্ত তার শান্তি নাই।
ভাগ্না চালাক ছেলে। গাড়ী হোটেলের সামনে থামতে সে মামার আড়ালে বললো, এমিলির ফোন নাম্বারটা দরকার।
দরকার? মামার বাড়ির আবদার আর কি। নোমান সহজ পাত্র নয়।
আমাকে বরং তোমার ফোন নাম্বার দাও, আমি এমিলিকে দিয়ে দিব।

দু'দিন ইমেল চেক না করলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত দুনিয়া উলোট পালট হয়ে যেতে পারে। তারপর আবার ফেস বুক। দিনে অন্ততঃ দু'বার চেক না করলে ভাত হজম হওয়া কষ্ট। নওরিনের নতুন ছবিতে ফেসবুক ছয়লাব। বৈশাখী মেলা হয়েছে আর্লিংটনে। সে শাড়ি পরে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছে। একেক পোজে একেকটা ছবি। না হলেও বিশটা ছবি তুলে দিয়েছে নওরিন ফেসবুকে। তাতে আবার উৎসাহী জনগণের কমেন্টস। এক ছবিতে দশটা পনেরটা কমেন্টস। হঠাৎ পিন্টুকে দেখা গেল ফেসবুকে। এখনি তার তদন্ত মূলক জিজ্ঞাসা শুরু হয়ে যাবে। ইংরেজী অক্ষরে বাংলা কথ্য ভাষায় সে লিখলো,

- কিরে ছবি আপলোড করিস না ক্যান?
- করবো। আজ রাতে কিছু আপলোড করবো।
- এখন কোথায়?
- হোটেলে।
- যাচ্ছে কেমন?
-ভাল, অনেক কিছু দেখলাম।

তারপর সরাসরি এমিলির কথায় চলে আসলো পিন্টু।

- ফ্লাইটের ওই মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হইছিল?
- হ্যা। আমার সাথে সিটি ট্যুরে গেল। আর তার মধ্যে আবার যা একটা ঘটনা।

ওদিকে টাইপ করা বন্ধ। পিন্টুর কোনো সাড়া শব্দ নাই। তার কৌতূহল কি কমে গেছে?

- কি রে, আছিস?
- দাঁড়া ফোন দিচ্ছি।

সাথে সাথেই ফোনটা বেজে উঠলো। এমন জবর ঘটনা ইংরেজী অক্ষরে পড়ে মজা নাই। ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নোমান বললো,

- তোর কথা বলেছি এমিলিকে। ছবিও দেখাইছি। তোকে খুব পছন্দ করছে। ফোন নাম্বার নিবি?

নোমান খোঁচাটা গায়ে মাখলো না।

- আরে ওই যে বললি একটা ঘটনা, সেটা কি? সেটা বল।

কৌতূহলের কারণে মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে যায়। নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে। পিন্টু আবিষ্কার করছে অন্যের হাঁড়ির ভেতরের খবর।

এমিলির কোনো সাড়া শব্দ নেই। নোমান দু'বার চেষ্টা করলো, কিন্তু এমিলি ফোন ধরলো না। কিছু একটা গোল বেঁধেছে তার বাসায়? তার কাজিন হোজে মনে হয় বলে দিয়েছে নোমান নামে কাউকে সে চেনে না। আর কি হতে পারে? তার কোনো ব্যবহারে অপছন্দ করেছে সে? হতে পারে। একেক দেশের একেক রীতি। পেরুবিয়ান রীতি সে জানে না। অথবা সে এখন হয়তো লিওর সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। গাড়িতে তাদের ফোন নাম্বার বিনিময় হয়েছে। এসব ছেলে খবিস টাইপের হয়। কি আর করা। এখন ইংলিশ টু স্প্যনিশ বইটা পড়বে নাকি একটু? কাল সাথে কেউ থাকছে না, দু'চার লাইন স্প্যানিশ জানা থাকলে অনেক সুবিধা। হয়তো ট্যাক্সি আলাকে বলতে হবে, কাল সকাল সাতটায় আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিও। তার স্প্যনিশ কি? এক ঘন্টায় আর কি শিখতে পারবে। বইটা বরং সাথে রাখলেই হয়, যা জিজ্ঞেস করার বইয়ের পাতা খুলে দেখিয়ে দেবে।

এয়ারপোর্টে বড় বড় করে শ্বাস কষ্ট নিবারক ওষুধের বিজ্ঞাপন। ওষুধের দোকানও দেখা যাচ্ছে। এমিলির দেওয়া ট্যাবলেটটা পকেটে। ওষুধ খাওয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। দেখাই যাক না কি হয়। প্লেনে উঠার পর বিশেষ একটা জিনিস খেয়াল করলো সে। ওভার হেড লকার থেকে লাল রংয়ের অক্সিজেন সিলিন্ডার বেরিয়ে আছে অনেকগুলো। ব্যাগ রাখার জায়গায় অক্সিজেন সিলিন্ডার এই প্রথম দেখলো নোমান। প্লেন ছাড়তে আরো দশ মিনিট বাকী। মন বলছে ওর আজকে শ্বাস কষ্ট হবে। অতো উঁচুতে বাতাস খুব পাতলা। সেই বাতাস থেকে যথেষ্ট অক্সিজেন ফুস ফুসে যাবে না। দম বন্ধ লাগবে। বদ্ব ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এলেও উপশম হবে না। সে মৃগী রোগীর মতো মাথা ঘুরে পরে যাবে কুসকোর রাস্তায়। কারণ বাতাস খুব পাতলা। অপরিচিত কতগুলো বিদেশী মানুষ তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে যাবে অচেনা জীর্ণ কোনো হাসপাতালে। প্লেন এখনো রানওয়েতে। আচ্ছা এখন কি নামা যায়? না হয় নাই গেলো সে মাচুপিচু? লিমা দেখ হয়েছে, সেটাই বা মন্দ কি? নামতে হলে তার থ্রি ইডিয়েটস মুভির মতো আইলের মধ্যে অভিনয় করে পড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভাল মুসিবৎ! নাহ, অন্ততঃ ট্যাবলেটটা খাওয়া উচিৎ।

কুসকো এয়ারপোর্ট ছোট একটা এয়ারপোর্ট। কোনো ঝামেলাই নেই। সেখান থেকে বেরুতে দেখলো পাহাড়ি এলাকা, চারিদিকে প্রাশান্তি। একজনের হাতে নেম প্লেট, সেখানে তার নাম লেখা। লোকটি তাকে দেখে বললো হাহির? ইংরেজী 'জে' অক্ষরটির উচ্চারণ স্প্যানিশে 'হ'। জুয়ান যদি হুয়ান হয়, জোসে যদি হোজে হয়, জাহিরকে তাহলে হাহির হতেই হবে। নোমান হাত মেলালো, তারপর বললো মি নম্রে এস হাহির।
লোকটি বললো মি নম্রে এস গার্সিয়া। কোমোস তাস।
কমন পড়ে গেল। মানে কেমন আছো।
এস্তোয় বিয়েন। মানে ভাল আছি।
তাতেই হলো কাল। গার্সিয়া ব্যাগ গাড়িতে তুলে হোটেলে যেতে যেতে বলতে শুরু করলো লুগার মুই বিয়েনে। বিয়েন ভেনিদেসে কুসকো। নিজেই কথা বলে যাচ্ছে সে। নোমান যে অংশ নিচ্ছে না তাতে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। থামানো যায় কিভাবে এখন?
আবলো ইস্পানিওল। নো স্প্যনিশ।
শুনে একটা হোচট খেল গার্সিয়া। তারপর শুদ্ধ ইংরেজীতে বললো এতক্ষণ বলো নাই কেন?
কাল বইটা দু'পাতা পড়েই তো মুশকিল হলো। আর তুমি যে বাছাধন ইংরেজী বলতে পারো তাতো বুঝি নাই।

শহরে প্রাচীন দালান কোঠা। পাথুরে রাস্তা। ইনকা সাম্রাজ্য পরিচালনা হতো কুসকো থেকে। পিজারো এ শহর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বড় বড় গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে বানানো সাকসায়ামার নিপুণ দূর্গ আর অট্টালিকা। প্রশস্ত রাস্তা ঘাট। সুপরিকল্পিত একটি শহর। পিজারো ভাইস রয়কে লিখে পাঠালো, এ এক সমৃদ্ধ শহর। এমন একটি শহর স্পেইনেও বেশী নেই।

ইনকাদের তীর ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারতো না। সেটাই ইনকা সেনাবাহিনীর কাল হয়ে দাঁড়াল। তা না হলে ইনকাদের পারভুত করা কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রতাপশালী ইনকা সম্রাট আতাহুয়াল্পাকে কৌশলে বন্দী করে ফেললো সেনাপতি পিজারো। আতাহুয়াল্পার মুক্তির জন্যে দুটি ঘর সোনার মোহরে ভরে দিয়েছিল ইনকারা। কিন্তু আতাহুয়াল্পা মুক্তি পায় নি। বরং তার মৃত্যুদন্ড হয়ে গেল।

পথের ধারেই উঁচু টিলার উপরে একটি বিশাল ইনকা মূর্তি। পাথরের তৈরী। এক হাতে বল্লম আরেক হাত শহরের দিকে। আহ কি ভাস্কর্য করে রেখেছে, সেই কত শ' বছর আগে! গার্সিয়া কি ইনকা? বেটে পুরুষ্টু রোদে পোড়া শরীর, সে হয়তো ইনকা সম্রাট আতাহুয়াল্পার বংশধর।
গার্সিয়া জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে?
- চমৎকার লাগছে। এই মূর্তিটা কত আগের জান তুমি?
- হ্যা। দু হাজার সালে তৈরী।
- দু' হাজার বছর আগের! হতেই পারে না!!
- দু'হাজার সালে তৈরী।
- ওহ, মাত্র দশ বছর আগের?
গার্সিয়া মজা পেয়ে দুলে দুলে হেসে উঠলো।
ইনকা মুর্তিটি আধুনিক কালের করা। কিন্তু হোটেল সোফিটেলের রাস্তা সাত শ' বছর আগের ইনকা সভ্যতার নিদর্শন। পাহাড় কেটে গ্রানাইট পাথর ফেলে করা হয়েছে রাস্তা। দু'পাশের দালান কোঠা পাথরের। কারিগরী বিদ্যা শিখেছিল ইনকারা। কলাম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু , বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা মিলিয়ে সাম্রাজ্য এতো বিশাল হয়েছিল যে আয়তনে তা রোমান সাম্রাজ্যের সমান ছিল। মাইলের পর মাইল রাস্তা তৈরী করাতে সেনা চলাচল, রাজ্য পরিচালনা সহজ হয়ে গেল। তারপর তৈরী করলো মাচুপিচু পাহাড়ের চুড়ায় সেই শহর, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাদপীঠ। তা দেখতে আজ দুনিয়ার সব দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসছে।
হোটেলে পৌঁছালে তারা সাদর সম্ভাষন জানালো। ছোট দু' তলা হোটেল। তাকে কিছুক্ষণ বসতে বললো। এই বসাটার একটা মাহাত্ম্য আছে। এর মাঝে একজন এক কাপে কালো রংয়ের চা জাতীয় কিছু দিয়ে গেল। এটা গরম কোকোয়া পাতার পানীয়। এটা খেলে শ্বাস কষ্ট উপশম। অদূরেই একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার। ওরা আড়ে আড়ে ওর অবস্থা পর্যবেক্ষন করছে। একটু হেচকি উঠার মতো হলেই
অক্সিজেন লাগিয়ে দেবে। শ্বাস কষ্টের কথা ভূলেই গিয়েছিল নোমান। এযাত্রা এমিলির দেওয়া বটিকায় রক্ষা পাওয়া গেল। তবে এখানেই শেষ নয়, মাচুপিচু এখনো বহু দূর।

সাকসায়ামা, পুকা-পুকাড়া এখানে দেখার মতো জায়গা। মার্কোসের সাথে সিটি স্কয়ারের ধারে এক রেঁস্তোরার ঝুল বারান্দায় নোমান লাঞ্চ করলো। সামনের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক । বিশাল সান বাঁধানো খোলা চত্বর, তার মধ্যখানে পানির ফোয়ারা। দু'পাশে আধা প্রাচীন ব্রিটিশ আমলের সারি সারি দ্বিতল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ কথাটি ঠিক হলো না। এদেশ বৃটিশের অধীন ছিল না, ছিল স্প্যনিশদের অধীন। অন্য দু' পাশে দু'টো প্রকান্ড উঁচু গির্জা স্প্যনিশ উপনিবেশের মূর্তিমান চিহ্ন নিয়ে কালের স্বাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে অনুচ্চ পাহাড়ের

পটভূমি। খোলা চত্বরে মানুষ কারণ ছাড়াই ভিড় জমিয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে কবুতরেরা জরুরী ভঙ্গীতে আনাগোনা করছে। নতুন শহরে কবুতর থাকে না, কিন্তু প্রাচীন পুরাকির্তীর শহরে কবুতর রাস্তায়, লোহার ব্রীজের উপরে ঝাঁক বেঁধে বসে থাকে। রাজা রাজরারা কবুতরকে ডাক পিয়ন হিসেবে ব্যবাহার করতো বলেই হয়তো পুরানা স্থাপত্যের কদর এরা বোঝে । নোমান পাহাড় দেখতে দেখতে মুগ্ধ গলায় বললো এত সুন্দর একটা জায়গায় বাস করতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার।
মার্কোসের মুখ কাল। পারলে সে এখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। কথা হয়তো ঠিক। দু'দিনের জন্যে এলে অনেক কিছূই ভাল লাগে। গম ক্ষেত ভাল লাগে, জঙ্গল ভাল লাগে। কিন্তু থাকতে গেলে মনে হয় অন্ধকার যুগে চলে এলাম।
আলপাকার সুস্বাদু গ্রীল করা মাংস খেল তারা। হরিনের মাংসের চেয়েও ভাল মাংস আছে তা নোমান জানতো না। মার্কোসের কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ট্যুরিস্ট সিটিতে সবাই অল্প বিস্তর ইংরেজী জানে। মার্কোস ভাল চাকুরী খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। আপাতাতঃ এক দোকানে ছোট মোট কাজ করে। বিনে পয়সায় খেতে পেয়ে মার্কোসকে খুশী বলেই মনে হলো। তার উপর উপাদেয় খাবার।
- এমিলির সাথে কথা হয়েছে তোমার?
- ওই সেদিন ফোন দিল তারপর আর কথা হয় নি। কেন?
- নাহ এমনি। সে খুব উপকার করলো।
তাহলে মার্কোসও এমিলির খবর জানে না। তার হলোটা কি?

পুকা-পুকাড়া দেখা হলো না। ওরা খেতে খেতেই ট্যুর বাস চলে গেছে। কিন্তু সাকসায়ামা দেখা হলো। এটাই ছিল ইনকাদের সেই শহর, যেখান থেকে তারা বিরু রাজ্য পরিচালনা করতো। বড় বড় পাথর কেটে নিপুন ভাবে বসিয়ে শহর বানানো হয়েছে। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। কে নিয়ে এল এতো বড় পাথর? অনেক মানুষ সারাদিন টেনে টেনে একেকটা পাথর এনেছে? এসমস্ত ক্ষেত্রে আরেকটা বড় প্রশ্ন থাকে, পাথর এলো কোত্থেকে? আশেপাশের কোনো পাথরই যে মেলে না! পিরমিডে সেই একি প্রশ্ন। অত আগে, ক্রেন নেই, বাষ্প ইঞ্জিন নেই, কে আনলো বিশালাকৃতির পাথরগুলো? কোত্থেকে আনলো? কে তাদের মসৃন করলো? আর একটা আরেকটার উপরে বসালো? মিশরেরটা তবু বলা যায়, গিজার পিরামিডের দেয়ালে, কফিনে, প্যাপিরাসের পাতায় অনেক ইতিহাস লিপিব্ধ আছে। ফারাওরা বানিয়েছে, পদ্বতি নিয়ে দ্বিমত আছে কিন্তু তারা যে অগুণিত ক্রীতদাসের পেশী শক্তি দিয়ে এতো বড় বিস্ময়কে তৈরী করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কেউ কেউ আবার সে বিষয়েও সন্দেহ পোষন করে, যেমন এরিক ফন দানিকেন। তার মতে পিরমিড মানুষের তৈরী নয়। হতেই পারে না। যেভাবে পুর্ব-পশ্চিম দিক নিখুঁত নির্ধারণ করে পিরামিড বানানো হয়েছে তাতে অগ্রসর টেকনোলজী প্রয়োজন। সে টেকনোলজী নিয়ে এসেছে ভিনগ্রহের মানুষ। আদিম যুগেই সব কান্ড কারখানা হয়েছে। আমাদের পোড়া কপাল, ভিন গ্রহের প্লাটিনামের মানুষ দেখি না, অলৌকিক ক্ষমতার মুনি ঋষীও আসে না। যে কোনো তথ্যকে সামান্য পরিবর্তন করে তিলকে তাল বানানো সম্ভব। যেমন কিছু দিন আগে এক মতবাদ আমদানী হলো, মানুষ আসলে চাঁদে যায় নি। সব ধোঁকা। এরিজোনার মরুভুমির ছবি দেখিয়ে বলে চাঁদে গিয়ে ঘুরে এলাম। গুজবে আনন্দ বেশী, গুজবের গতিও বেশী। যে গুজবে

কান দেয় তার সঠিক তথ্য আহরণের মাধ্যম নেই। একদিন পৃথিবী জুড়ে গুজবের জয় জয়াকার হবে। এই সেদিন গুজব উঠলো ক্যানসাসে বড় একটা ট্রাকে পিরিচাকৃতির অতিকায় একটি আশ্চর্য বস্তু গোপনে পুলিশ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সেট এতো বড় যে রাস্তার লাইট পোস্ট আটকে গেলে, শেষে লাইট পোস্ট কাটতে হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই ভিন গ্রহের যান, কোনভাবে বিকল হয়ে পৃথিবীতে এসে পরেছে। সরকার কাউকে জানতে দিতে চায় না তাই ঢেকে ঢুকে নিয়ে যাচ্ছিল। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাদের ধারাণা, পৃথিবীর সব বড় রাষ্ট্রের সরকার ইউ, এফ, ও (Un-identified Flying Object) সম্পর্কে জানে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা চেপে যায়। ক্যানসাসের গুজব বাড়ছে দেখে সরকার বাধ্য হলো আসল তথ্য ফাঁস করতে। ওটা ছিল একটা মানব বিহীন যুদ্ব বিমান, যাকে বলে ড্রোন। তা তৈরী হয়েছে এদেশেই, তৈরী করেছে নর্থপ গ্রুমান।

- ওটা দেখেছো?

মার্কোস সাকসায়ামার পাথর ঘেরা চত্বরের ভেতরে যে জিনিসটা দেখালো সেটা খুবই চমকপ্রদ একটা প্রাণী। ছাগলের মতো, ঘাস খাচ্ছিল, কিন্তু মুখটা লম্বাটে, কোথায় একটা হরিন হরিন ভাব আছে। এর নাম আলপাকা। একেই ভক্ষন করেছে চিন্তা করে খারাপ লাগলো নোমানের।

- মাচুপিচুতে গেলে ইয়ামা দেখতে পাবে, ইয়ামা দেখেছো?

- ইয়ামা না লামা?

- স্প্যানিশে ইয়ামা।

তখন মনে পড়লো দু'টা 'এল' থাকলে উচ্চারন হবে 'য়'। যাকে আমরা বলি পোলো, সেটা ওরা বলে পোয়ো, লামা হলো ইয়ামা। আর তাকে ওরা ডাকবে হাহির বলে।

- খুবই আশ্চর্য হওয়ার মতো প্রাণী।

তা তো হতেই হবে। আশ্চর্য হতেই না আসা। আর কি আছে আশ্চর্য হ ওয়ার মতো? ফোনটা বেজে উঠলো এসময়। এমিলি নয়তো, সেই যে সে গাড়ি থেকে নেমে গেল, আর খবর নেই। কিন্তু না, পিন্টুর ফোন।

- কোথায়?

- সাকসায়ামা দেখতে আসছি। আলপাকা দেখলাম। ছাগল আর হরিনের মাঝামাঝি প্রাণী।

- তাই, খাওয়া যায়?

- একটা সুন্দর প্রাণী দেখলাম, তোর মাথায় খাওয়ার চিন্তা?

পিন্টুকে সহজে অপ্রস্তুত করা যায় না। সে জোর গলায় যুক্তি দিল-

- আরে মানুষ তো কার্নিভোরাস। জন্তু জানোয়ার ঘাড় মটকে টাটকা আহার করে, আমরা ছাল ছাড়িয়ে, কেটে কুটে, লবন মসলা মেখে সেদ্ধ করে খাই।

কি জঘন্য বর্ণনা। খাবার মজাটা নষ্ট হয়ে গেল। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল নোমান,

- পলির কি খবর?

- লোকমান সাহেব খুব নর্মাল। এমনভাব কিছুই হয় নাই।

কি কথার কি উত্তর! পলি মানে কি তার বাবা? একটা বড় ঘটনা ঘটলে মানুষ পর্যবেক্ষণ এবং গবেষনা শুরু করে। মুখোভাব, গতিবিধি লক্ষ্য করে। বড় বড় নিউজ মিডিয়া তা করছে। নিছক একটা অভিযোগ উঠলে মানুষটির চুলচেরা বিশ্লেষন। গবেষকের পর গবেষক, অনুমানের পর অনুমান করে যাচ্ছে।

- আবার শুনতেছি ও নাকি আসলে ভাগে নাই। আটলান্টায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে।
ওহ এই ব্যাপার। মানুষ কিভাবে তিলকে তাল করে!
ট্যাক্সি ড্রাইভার স্প্যনিশে কিছু বললো যা নোমান বুঝলো না। মার্কোসকে দেখিয়ে দিল সে। বিনে পয়সার দোভাষী। মার্কোসকে বলবে নাকি তার সাথে মাচুপিচু পর্যন্ত যেতে? আবার ফোন বেজে উঠলো। এবার নিশ্চয়ই বি, বি, সি শিপন। ওদিকে নারী কন্ঠ। আরে এতো এমিলি! কাল থেকে ফোন করে নি কেন সে? ঘটান আসলে সে যা চিন্তা করেছে তার কোনোটাই না। এমিলি বাসায় যাওয়ার পথে বাসে ফোন হারিয়ে ফেলেছে। ফোন হারানোর রেকর্ডে নাকি গিনেস বুকে তার নাম উঠতে পারে যে কোনো দিন। নতুন আরেকটা ফোন নিল মাত্র কেবল। তার গলায় খুশীর ভাব। কি জন্যে তা বোঝা গেল না। তাহলে ট্যুরিস্ট ছেলের সাথে বাইরে ঘুরাফিরা করতে গিয়ে ধরা পরার কারণে তার কোন শাস্তি পেতে হয় নি।
ওষুধটা খেয়েছিলে?
হ্যা, ওটা খেয়েই তো রক্ষা। এখন মার্কোসের সাথে সাকসায়ামা দেখছি। মার্কোস আবার হাত বাড়িয়ে ফোন চাচ্ছে, এমিলি নাকি, আমাকে দাও তো কথা আছে। সে ফোন নিয়ে স্প্যনিশে কথা শূরু করে দিল। নোমান সম্পর্কে কিছু বলছে না তো আবার?
লিমায় ফিরে গেলে দেখা হবে কিনা, সে কথাটা জিজ্ঞেস কারার সুযোগ পেল না নোমান।

কাক ডাকা ভোরে উঠতে হলে মেজাজটা খিঁচড়ে থাকে। মাচুপিচু দেখতে এর গত্যন্তর নেই। ব্যাগের মধ্যে আগেই প্রয়োজনীয় জিনিস ঢোকানো ছিল। তারপরেও নোমান দেখে নিল পাসপোর্টটা নিয়েছে কিনা। কিন্তু তার আসলে পাসপোর্ট দরকার ছিল না। পরে জানলো এখানে কখনো রাস্তায় পাসপোর্ট চেক হয় না। যারা জাল পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার জন্যে আসে, তারা মাচু পিচু দেখতে যায় না। যা দরকার ছিল তা নিতে সে ভুলে গেল। মাচুপিচুতে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে হঠাৎই থেমে যায়। ছাতা না থাকলে ভিজতে হবে। সে ছাতাও এনেছিল কিন্তু সেটা ব্যাগে ঢোকাতে ভূলে গেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে অদূরেই ঢাকা চিটাগাং রোডের বাসের মতো একটা বাসে গিয়ে উঠলো নোমান। ঘুম ভাল হয় নি। সারাদিন জার্নি করতে হবে কিন্তু তার চোখ এখনই বুজে আসছে। কে একজন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে তাকাতেই দেখলো একটা মেয়ে ব্যাগ উপরে তোলার চেষ্টা করছে। 'লেট মি হেল্প ইউ' বলে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে কিছূ বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাগ উপরে তুলে রেখে দিল নোমান। একটু গায়ে পরেই কাজ করা হলো। মেয়েটি মোটেও খুশী নয়। বেজার মুখে বললো গ্রাসিয়াস। তার মানে ইংরেজী জানে না? নোমানো বললো, গ্রাসিয়াস, বুয়েনেস দিয়েস। ভেবেছিল তার পাশে বসবে, কিন্তু মেয়েটি বসলো তার পিছনের সীটে। যাক, সারাটা পথ তো পড়েই আছে। একটু পরে মাথা ঘুরিয়ে নোমান বললো, হাউ আর ইউ? মেয়েটি বললো, বিউটিফুল। লুক ওভার দেয়ার। তখন সে চোখ খুললো। সত্যি বিউটিফুল। চারিদিকে ঝকঝকে রোদ, একটা অপূর্ব জংগলের মধ্যে ছবির মতো এক নদী বয়ে চলেছে। তার পাশে একটা রূপকথার মতো সুন্দর পাহাড়। পিছনের সিটে শ্বেতাঙ্গ বুড়া বুড়ি বসেছে। বুড়ি বুড়াকে বলছিল, বিউটিফুল, লুক ওভার দেয়ার, দ্যাট ইজ উরুবাম্বা রিভার। প্রকৃতিতে

এতো সৌন্দর্য্যও আছে! গাড়ি যত যাচ্ছে সামনে, ততই যেন লোকালয় আর যান্ত্রিকতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য উন্মোচিত হচ্ছে। তারা যাচ্ছে অজান্তাই তাইম্বু। সেখানে ছোট স্টেশান। বাস থেকে নেমে ট্রেন ধরতে হবে, সেই ট্রেন পাহাড় বেয়ে নিয়ে যাবে মাচুপিচুতে।

ট্রেন ছাড়ার আগে ঘোষনা দিল, তোমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভ্রমনে নিয়ে যাব আমরা, যা কোনো দিন ভোলার নয়। সে তো বলবেই, নিজের কথা ফুলিয়ে ফাপিয়ে কে না বলে। পাশে এক চিন্তাশীল ব্যক্তি বসলো। মধ্য বয়স্ক, চোখে পুরু চশমা, হাই হ্যালো বিনিময় করার পরে সে আপন জগতে চলে গেল। অন্য ধারের দু'টি সীটে দু'টি শ্বেতাঙ্গীনি মেয়ে। জিনসের সাথে সুতির সাদা টি শার্টে তাদের অপূর্ব লাগছে। তারা ক্যামেরা বের করে ছবি তোলার জন্যে প্রস্তুত। নোমানের দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। ভারি ব্যাগ তাদের সাথে নেই যে তুলে দেওয়ার কোনো মওকা মিলবে। সামনের দু'টো সীটে দু'জন প্রায় শ্বেতাঙ্গ তরুণ-তরুণী, নামকরা হলিউড চিত্র তারকাদের চেয়ে দেখতে কোনো অংশেই কম নয়, ফুটফুটে একটা বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে মাচুপিচু দেখতে। কথা বলছে স্প্যানিশে, আশে পাশের কোন দেশের হবে, তবে পেরুবিয়ান নয়। ট্রেনটা চমৎকার, চারিদকে জানালা, ছাদের খানিকটা স্বচ্ছ। তার থেকে সুন্দর যাত্রী গুলো, অবশ্য সে নিজে ছাড়া। কিন্তু দু'পাশের দৃশ্যের সাথে আর কিছুর তুলনা চলে না। শুধু পাহাড় বলেই সুন্দর লাগছে তা নয়। এর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষন আছে। মেয়ে দু'টো হুমড়ি খেয়ে পটাপট ছবি তুলছে। পাশের চিন্তাশীল মানুষটি শুধু গভীর দৃষ্টিতে ট্রেনের ওপাশের কামড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। দুঃশ্চিন্তা তো বাসায় বসে করলেই হয়, তার জন্যে এত নদী নালা পেরিয়ে ট্রেনে উঠতে হবে?
যত যাচ্ছে তারা ততই অপূর্ব দৃশ্য। কখনো ডান দিকের দৃশ্য বেশী আকর্ষনীয়, কখনো বা দিকেরটা তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা সীট ছেড়ে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে তাকিয়ে গোগ্রাসে যেন দৃশ্য গিলছে। সবুজ মাঠ বেশ খানিকটা বিস্তৃত, তারপর পহাড়, সেটাও সবুজে ছাওয়া। মাটির ঢিবির মতো পাহাড় নয়, মনে হতে পারে মাঠটাই হঠাৎ যেন আকাশের দিকে উঠে গেছে। উঁচু, কিন্তু অনেক উঁচু নয়। মানসপটে নোমান দেখতে পেল, অনেক গুলো ইনকা সেই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। এতোদূর থেকে তাদের ছোট লাগছে। একজনের মাথায় বনমোরগের কয়েকটা পালক। সেই হয় তো দলপতি। ওদিকে সবাই হুটোপুটি করে ডান দিকে একটা উঁচু, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো বাস্তব পাহাড় দেখতে ভাল জায়গা বেছে নিচ্ছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি পর্যন্ত দেখার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। আবার বাঁ দিকে পরলো নদী, কুলু কুলু বয়ে চলছে পাহাড়ের গা ঘেষে। মাইলের পর মাইল অপূর্ব দৃশ্য। চোখ ফেরানো যায় না। এবড়ো থেবড়ো নয়, নিপাট, মনোমুগ্ধকর। সব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দেওয়ার মতো সম্মোহনী দৃশ্য। কিন্তু চিন্তা একেবারে দূর করা গেল না। এক্সকিউজ মি শুনে ঘুরে তাকাতে দেখে সোনালী চুল তরুণীদের একজন ছবি তুলে দিতে বলছে। কেন নয়? অবশ্যি তুলে দিব। তারা দু'জনে পোজ নিয়ে দাঁড়াল, চোখে সুদৃশ্য সানগ্লাস। আসলে সানগ্লাস সুদৃশ্য নয়, ওদেরকে সানগ্লাসে সুদৃশ্য লাগছে। নোমানকে সানগ্লাসে সচরাচর স্মাগ্লারের মতো লাগে। ছবি তোলা হলে একটা যান্ত্রিক থ্যাঙ্ক ইউ পেলো নোমান। এখানে সহজে চিড়ে ভিজবে বলে মনে হয় না। তাও ওদের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পাহাড়

দেখলো নোমান। মনের দুঃখ, গ্লানি, ক্ষুদ্রতা সব দূর করে দেওয়ার মতো সুন্দর প্রকৃতি। শুধু বৈচিত্র আর বৈচিত্র। কখনো উঁচু, কখনো নীচু, কখনো কাছে, কখনো অবারিত প্রান্তরের ওধারে। কখনো সেটা অনেক উপরে উঠে এমন ভাবে এদিকে ন্যুয়ে আছে যে চোখ ফেরানো দায়। ট্রেনে খাবার দেয়া হচ্ছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিটি স্যান্ডউইচের সাথে চিনি ও দুধ ছাড়া কফি নিল। নোমান বিস্কিট আনতে ভুলে গেছে। বেশী চিনি ও দুধ দিয়ে এককাপ কফি খেল সে। এমন একটি চমৎকার দিনে, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাঝে খাই খাই করতে নেই। উদর তো সব সময়ই ভরে, আজ না হয় মন ভরে উঠুক কানায় কানায়। ট্রেন ধেয়ে চলেছে পাহাড়ি পথ ধরে । গন্তব্য দি লস্ট সিটি।

চার ঘন্টা কোত্থেকে চলে গেল বলতে পারবে না সে। মাচুপিচু পাহাড়ের গোড়ায় এসে থামলো ট্রেন। তাদের ঘোষনায় তেমন বাড়াবাড়ি ছিল না। এমন ভ্রমন ভোলার মতো নয়। এখন আবার বাসে করে যেতে হবে উপরে, লস্ট সিটিতে। এর মধ্যে ছোট কয়েকটা গ্রুপ তৈরী করে একজন করে গাইড দেওয়া হলো। তার গ্রুপে পড়লো চিন্তাশীল ব্যক্তি, এতোক্ষনে নামটা শূধু জানা হয়েছে, ডেভিড। আর কয়েকজন বুড়াবুড়ি। স্বর্ণকেশী দু'জন পরলো অন্য গ্রুপে। নোমান যে ছবি তুলে দিল, তা বেমালুম ভুলে গেছে তারা। ওর দিকে তাকিয়ে দু'জনের একজনও চিনতে পারলো না।

বিপজ্জনক রাস্তা কিন্তু যাত্রীদের মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। রাস্তার পাশটা খাড়া নেমে গেছে, একটি পয়সা ফেললো হয়তো সোজা গিয়ে উরুবাম্বা নদীতে পরবে, কিন্তু পরতে পয়সার সময় লাগবে দুই মিনিট। মাচুপিচুতে এসে প্রথম দেখা হলো ইয়ামার সাথে। হাঁটা পথের উপরে 'তেনারা' আপন মনে ঘাস খাচ্ছেন। তাদের গলা অনেক লম্বা, মুখটা উটের মতো, ধরটা হরিনের মতো। পিজারো যখন প্রথম দেখেছে তখন অবাক হয়েছিল। সে নাম দিয়েছিল ছোট উট। তিনটা ইয়ামার মধ্যে দু'টা ইয়ামা বসে আছে, আরেকটা ঘাস খাচ্ছে। এতো অদ্ভুত প্রাণী চিড়িয়াখানাতেও সচরাচর চোখে পরে না। সাতজনের দলটাকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়ে এক জায়গায় এনে জড়ো করে ইনকা গাইড বললো, ওই যে দেখো মাচুপিচু শহর। তখন সবাই ঘুরে সেদিকে তাকাতেই পরিষ্কার দেখতে পেল পাহাড়ের একটা সমতল জায়গায় প্রকান্ড পাথর দিয়ে বানানো সারি সারি ঘর। কয়েক ধাপে উপর নীচ করে পরিকল্পিত ভাবে বানানো হয়েছে। তার ওপাশে গাছপালা ভরা বিশাল এক গিরীশৃঙ্গ মুর্তিমান বিস্ময়ের মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। গহীন অরণ্যে পাহাড়ের চুড়ায় কেন তারা এমন একটা শহর গড়ে তুললো কে বলতে পারে। কুসকো ছিল ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর মাচু পিচু তাদের ধর্মীয় প্রাণ কেন্দ্র। অনেকে বলে আশি মাইল দূরের কুসকো শহর থেকে এই পাথর নিয়ে আসা হয়েছে। কিছূ পাথর প্রায় মানুষ সমান উঁচু। সেটা হাতি দিয়ে টেনেও নড়ানো যাবে না। এই খর্বাকৃতির মানুষেরা সাত শ' বছর আগে তা বহন করে আনলো কিভাবে?

ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসে ইনকাদের ঘর গুলো একটার পর একটা দেখতে শুরু করলো তারা। পাতার ছাদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু ভারী পাথরের দেয়াল গুলি এখনো সেভাবেই রয়েছে। গাইড বললো এটা

মন্দির ঘর। মন্দির ঘরটি একটু ঘোরানো, কয়েকটি জানালা দিক নির্ণয় করে এমনভাবে বসানো যেন সূর্যের উত্তরায়ণের সময় রশ্মি উল্লম্ব হয়ে ঘরের মধ্যখানের বেদীতে এসে পরে। ও পাশের বড় সভা কক্ষটির মাঝে পানির উপরে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতো। কি নিয়ে সভা হতো এখানে? সূর্য দেবতার রোষানল থেকে বাঁচার উপায় কি?

পৃথিবীতে অনেক বিস্ময় আছে। মাচুপিচুর মধ্যে বিস্ময়ের চেয়ে বেশী আছে সৌন্দর্য্য। অবারিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রায় জঙ্গলী মানুষের সভ্যতার দ্বার প্রান্তে উঠে আসার সৌন্দর্য্য। অনেক নীচে রূপালী ফিতের মতো এক চিলতে নদী, ছোট ছোট গাছ পালায় ভরা সবুজ পাহাড়ের ওঠা নামা, সামনে এবং পিছনে দু'টো উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের অনেক উপরে উঠে যাওয়া, আর সার সার পাথরের প্রাচীন ইনকা ঘর- আজীবন মনে গেঁথে থাকার মতো বিরল এক দৃশ্য। কে যেন বলেছিল - Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.
এখানে এসে মনে হলো, সেটা খুব সত্যি কথা।